বিআইডিএস পাবলিক লেকচার: নিউ সিরিজ নং-০৮

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধঃ পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের বিকাশ

আতিউর রহমান

অক্টোবর ২০২৩

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

বিআইডিএস পাবলিক লেকচার সিরিজ

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধঃ পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের বিকাশ

আতিউর রহমান

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)
ই-১৭, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
জি.পি.ও বক্স নং ৩৮৫৪, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪৩০-৩৭
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪১০
ই-মেইল: publication@bids.org.bd
ওয়েবসাইট: www.bids.org.bd

কপিরাইট © অক্টোবর ২০২৩, বিআইডিএস

মূল্য: ৳১০০.০০; ইউএস ডলার ৫

কভার ডিজাইন ও লে-আউট
মুহাম্মদ আহছান উল্যাহ বাহার

মুদ্রণ: মাতৃভাষা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১২৯, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধঃ পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের বিকাশ

আতিউর রহমান*

প্রথমেই ২০২২ সালের আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমাকে বেছে নেয়ায় অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃপক্ষের প্রতি। হাতে গোনা যে অল্প ক'জন বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদকে আমরা প্রকৃত অর্থেই সর্বজনের বুদ্ধিজীবী বা 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল' বলতে পারি ড. আব্দুল গফুর তাঁদের অগ্রভাগেই থাকবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া থেকে পিএইচডি করে আসা এই প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ শুধু যে নিজে তাঁর চিন্তা ও গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রান্তজনের কল্যাণের অর্থনীতিকে বেছে নিয়েছেন তা নয়, একই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য চিন্তকদেরও একই দিকে ধাবিত হতে উৎসাহ ও সহায়তা করে গেছেন আজীবন। আমার বিশ্বাস আমাদের সময়ের বরেণ্য অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক সুফলের সুষম বা ন্যায্য বণ্টন বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার জন্য উৎসাহ পেয়েছেন ড. গফুরের কাজগুলো থেকে।

ড. গফুর ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস (পিআইডিই)-এ স্টাফ ইকোনমিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। বিআইডিএস-এ একজন গবেষণা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন ১৯৮৪-তে, এবং ১৯৯৫-তে অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ পদেই বহাল ছিলেন। বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েজ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব কিছু ছাপিয়ে আমার বিবেচনায় তিনি বিশেষ হয়ে উঠেছেন অর্থনীতি-বিষয়ক গবেষণা ও কর্মকাণ্ডে সব সময় ন্যায্যতাভিত্তিক বণ্টনের বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় বিবেচনায় রাখার কারণে। আর এ কারণেই সে সময়কার বাস্তবতায় গতানুগতিক বিষয়গুলোর বাইরে গিয়ে তিনি অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার পলিসি, ফুড পলিসি ইত্যাদিকে তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

---

*লেখক সিনিয়র ফেলো, বিআইডিএস, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নয়া-উদারবাদী এবং মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব- এই দুই ধারার চিন্তাকেই তিনি তাঁর গবেষণা ও লেখালেখিতে প্রতিফলিত করতে সদাসচেষ্ট থেকেছেন। ফলস্বরূপ এ দেশের সকল ধারার অর্থনীতিবিদ ও চিন্তকদের কাছেই তাঁর কাজগুলো প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে এবং আরও বহুদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে বলে আমার মনে হয়।

বৃহত্তর জনকল্যাণের বিষয়ে সদা সংবেদনশীল একজন একাডেমিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন। বিআইডিএস-এ ড. গফুরের সঙ্গে শুধু গবেষণাই করিনি, সমসাময়িক গণমুখী নানা রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনেও আমরা তাঁকে পাশে পেয়েছি। গবেষক ও সহযোগী কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সদাই অগ্রগামী। বরাবরই নিভৃতচারী সদা হাস্যমুখ ড. গফুরের গণমুখী চিন্তা-চেতনা বিআইডিএস-এর গবেষণাকে জনবান্ধব করতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। আগামী প্রজন্মের গবেষকদের কাছে তাঁর কাজগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরার মাধ্যমেই আমরা তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। আজকে তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে বক্তৃতার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে এই ভূখণ্ডে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশকে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ষাটের দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতার বিষয়েও প্রচণ্ড সচেতন ছিলেন ড. আব্দুল গফুর। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো সেখানেও সংগঠক হিসেবে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে আমরা জানি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পরিক্রমায় সে সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী শিক্ষিত তরুণরা প্রধানতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। ড. আব্দুল গফুরও সে সময় একজন রাজনীতি-সচেতন শিক্ষিত তরুণ হিসেবে কাজ করেছেন। তাই ঐ সময়কার রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে এই ভূখণ্ডের মধ্যবিত্তের বিকাশ নিয়ে একটি পর্যালোচনা হাজির করে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। আসলেই একাত্তর ছিল এক হিরণ্ময় সময়। একই সঙ্গে দুঃখের এবং আনন্দের। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি জান্তাদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে। তাদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়। শুরু হয় তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র।

আর নেয়া হয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা চিরতরে নস্যাৎ করার নানা উদ্যোগ। বাঙালিকে চিরতরে দাবিয়ে রাখার হীন ষড়যন্ত্রের মূলে চূড়ান্তভাবে কুঠারাঘাত করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐতিহাসিক ৬-দফা প্রদান করে তিনি বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেন। এই আকাঙ্ক্ষার উৎসভূমি ছিল বাঙালির ভাষা আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় এটি শুরুতে ভাষার লড়াই ছিল না। তা ছিল আর্থ-সামাজিক মুক্তির লড়াই। পরবর্তী সময়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার পালাবদল তথা বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করার সুযোগ এলেও চিরতরে তা নিঃশেষ করে দেবার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের সূচনা করে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। অনিবার্য হয়ে ওঠে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাঙালির কোনো একক শ্রেণির যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল গোটা বাঙালির সামগ্রিক জনযুদ্ধ। পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক কর্মী, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, আপামর নারী-পুরুষের যুদ্ধ। তবে, গ্রামীণ অর্থনীতির উদ্বৃত্ত থেকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই সাধারণত মূলধারার নেতৃত্ব উঠে আসে। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধে এই শ্রেণির ভূমিকা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর সামাজিক চাপ থাকে একটু বেশি। দরিদ্র ও উচ্চবিত্তের সংযোগ সাধনে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয় এ শ্রেণিকে। সামাজিকভাবে দ্রুত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি সমাজের নিম্নস্তরের অনিবার্য চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব—নিরন্তর এই দ্বৈত চাপের মুখে থাকে এ শ্রেণি।

ক্রমবিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক অংশের দ্রুত বিকশিত হতে না পারার ক্ষোভ এবং আরেক অংশের জীবনযাত্রায় টানাপোড়েনের জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষায়। এসব প্রবণতার সম্মিলিত শক্তি তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তবে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বুঝতে হলে এই শ্রেণির উৎপত্তি ও উদ্ভবের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক পর্যায়ে এই শ্রেণির নিজস্ব উন্নতির পথ হতে তাদেরকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা হয়। কার্যত ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নয়নের (ইউরোপীয়দের মতো) সকল উপসর্গ বিকশিত হচ্ছিল।

একদিকে জমিদারদের একটি শক্তিশালী দল বিকশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে স্বনিয়োজিত চাষীদের দল, প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীদের দলও নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে তুলছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে এই প্রক্রিয়াটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তবে সিরাজের পতনের আগে থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে স্থানীয় দালালদের দলে ভিড়িয়েছিল, তারা ছিল স্থানীয় পণ্য ক্রেতা আর ব্রিটিশ পণ্য বিক্রেতা। এদের বলা হতো গোমস্তা (রহমান ও আজাদ, পৃ: ৯)। পলাশীর যুদ্ধের পর এদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এই স্থানীয় দালালরা ছিল কোম্পানির প্রতিনিধি। যে প্রক্রিয়ায় সনাতনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হচ্ছিল এরা তার বাইরেই ছিল।

যথেষ্ট সম্পদ উপার্জনের পর এই প্রতিনিধিরা নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। তাদের কেউ কেউ সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজের জন্য প্রচুর অর্থও দান করেন (ঘোষ, পৃ. ১৩৮৬-১৪৬০)। কোম্পানি তাদের এই উত্তরণে নাখোশ ছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এসময় এমন কিছু নতুন নিয়মকানুন চালু করা হয় যা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে যায়। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় অথবা শিল্পে পুঁজি খাটাতে এসব বাধ্যবাধকতা নিরুৎসাহিত করে। কার্যত এর পরিপ্রেক্ষিতেই স্থানীয় পুঁজি ব্যবসায় অথবা শিল্পে না খেটে জমিদারি কেনার কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে (উমর, ১৯৮৭, পৃ: ১৬-১৭)।

১৮৩৭ সালের দিকে ফার্সির স্থলে ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষায় অধিষ্ঠিত করা হয়। এর ফলে জনগণকে বাধ্য হয়ে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়। এ সময় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত আমলা, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রশাসন এবং সমাজের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্পষ্ট কোনো অবদান ছিল না। কিন্তু যখন থেকে কৃষিখাতের উদ্বৃত্ত জমা হতে শুরু করে, তখন থেকেই কৃষকদের একাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এ সময় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অত:পর, ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯০২ সালে প্রণীত আইন কৃষকদের জমির মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০, পৃ: ২৮-২৯)। এভাবে কৃষকেরা তাদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার পাশাপাশি তাদের মধ্য থেকে একটি স্বাধীন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বের হয়ে আসার পরিবেশ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে তারা বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হতে থাকে।

তাদের এ বাড়তি আয় সন্তানদের শিক্ষাখাতে ব্যয় হতে থাকলো। এই প্রক্রিয়ায় ধনিক কৃষকদের উদ্বৃত্ত শিক্ষাখাতে ব্যবহৃত হয়ে তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ধারা জোরদার হয়। এ সময় আংশিকভাবে হলেও পূর্ব বাংলার অভিজাতরা কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল। বাণিজ্যিক পণ্য বিশেষ করে পাটের দাম বৃদ্ধি পেলে কৃষকের ছেলেমেয়েরা প্রথমে স্থানীয় শহরগুলোতে এবং পরে কলকাতা ও ঢাকায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া শুরু করলো। ততদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নতুন শিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং অন্যরা প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন পেশাদারি কাজে জড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকারও পায়। তাসত্ত্বেও তাদের একটি বড় অংশ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে সাধারণভাবে জড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের তৎপরতা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এক সময়ে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পূর্ব বাংলার এই শিক্ষিত অভিজনদের বেশিরভাগই তাদের মতো 'পাকিস্তান' চেয়েছিলেন। তবে সেই পাকিস্তান প্রাপ্তির পেছনে মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির বিষয়টিই মুখ্য ছিল। তারা আশা করেছিলেন, শোষণ-বঞ্চনার পরাকাষ্ঠা থেকে বেড়িয়ে এসে কিছুটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি করতে পারবে ঐ স্বাধীন দেশে। কিন্তু তারা শিগগিরই বুঝতে পারল যে, তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার নয়। তাই এ অঞ্চলে একটি নতুন বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন শুরু হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে এই জাগরণ জোরদার হয়। পাকিস্তানের প্রশাসন কৃষক শ্রেণিতে জন্ম নেওয়া পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে চায়নি। এই প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথমে গণতন্ত্রের জন্য এবং পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক বৈষম্য কাটিয়ে উঠতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মানসিকতা নিয়ে বিস্তৃত হয়। আর এভাবেই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন শক্তিশালী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত সুদৃঢ় হতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপাদান নিয়ে কথা বলতে গেলে দেখা যায়, ১৯৬০ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও পরিবহন ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক এলিট ছাড়া ২ কোটি ৬০ লাখ শ্রমশক্তির বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণির

কোনো একটি বর্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে না ধরলে মাত্র ৩৭ লাখ শ্রমশক্তি মধ্যবিত্ত হিসেবে শ্রেণিভুক্ত ছিল, যারা মোট শ্রমশক্তির ১৪.৩ শতাংশের মতো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত কৃষকদের পরিচয় জানার জন্য আমরা Pakistan Census of Agriculture, ১৯৬০ এবং Master Survey of Agriculture in Bangladesh ১৯৬৭-৬৮ (সপ্তম মুদ্রণের সপ্তম সংস্কার, ১৯৭২-এ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত)-এর ওপর নজর দিয়ে দেখতে পাই যে, এ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ লাখের কিছু বেশি। আরেকটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৬৭ সালে শ্রমজীবী হিসেবে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা ছিল সাড়ে ৮৫ লাখের কিছু বেশি। ঐ বছরের জন্য এ সংখ্যাটি ছিল মোট শ্রমশক্তির ৩২.৭৫ শতাংশ। এসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কিছু উপ-শ্রেণিও ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই (প্রায় ৭০ শতাংশ) ছিল স্বাবলম্বী গ্রামীণ কৃষক। আবার ছাত্ররাও ছিল দ্বিতীয় বৃহৎ মধ্যবিত্ত উপ-শ্রেণি। যারা পুঁজিপতি বা পেশাজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তবে তারা শুধু পিতা-মাতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিটি লেখক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, দোকান-মালিক ও কর্মচারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করলেও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা সবাই কমবেশি স্বাধীন শ্রেণির অন্তর্গত ছিল (দোকান কর্মচারীদেরকে এই শ্রেণিতে বিশেষ করে দোকান মালিকদের (অনিবন্ধিত) শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। তাদের আয়ের স্তর সমান বলেই তা করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যখন আঘাত করা হয় তখন সেই সঙ্কটের মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগগুলো সংখ্যায় বেশি ছিল না। এরাই ছিল ১৯৬৯ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় এক-দশমাংশ।

কেরানি এবং অন্য কর্মচারীরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় ৪ শতাংশ। সংখ্যায় কম হলেও তারা শহরাঞ্চলের অফিস ও কারখানগুলোতে কাজ করতো বলে যে-কোনো আন্দোলনে তাদের সহজেই সংগঠিত করা যেত। পক্ষান্তরে, নিবন্ধিত দোকান এবং ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোর কর্মচারীরা বরাবরই ঝুঁকির মধ্যে থাকতো। মালিকদের মানসিকতা সম্বন্ধে তাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। তাদের যে বিপুলভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তা এ সময়টাতেই তারা অনুভব করলো। তাদের

চাকরিদাতাদের নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে তাদের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। তারাই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করলো। তবে, রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগদানে সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল। তাদের চাকরির শর্তে তারা খুশি ছিলেন না। বেতন কাঠামো এবং আবাসন ও অন্যান্য সুবিধার দিক থেকে অসমতা তাদেরকে প্রায়ই আন্দোলনে উৎসাহিত করতো। যদিও তা সীমিত ছিল, তবুও কিছু রাজনৈতিক দল এই অসন্তোষকে দক্ষতার সাথে ঐ সময় কাজে লাগিয়েছিল। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীরা আকারে ক্ষুদ্র হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিল। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের ধারা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল। বিকাশমান বাঙালি জাতির বিবেক হিসেবে তারা বিবেচিত হতো এবং বৈষম্যের ভিত্তির গভীরতা অন্বেষণে তারা অসামান্য অবদান রেখেছিল। তারা শহরে বাস করতো এবং বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশ ছিল। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি সোচ্চার।

আইনজীবী ও চিকিৎসকগণ সংখ্যায় মাত্র ১৪ হাজার হলেও মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ এবং জনসাধারণের ওপর তাদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। তাদের কারো কারো ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল আইনজীবী এবং চিকিৎসক ছোটোখাটো সমাজ সচেতন গোষ্ঠী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। এরা আলোকিত মধ্যবিত্তের ধ্যান-ধারণাকে মূলধারার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

অবশ্যি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাত্ররা ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি জাতীয় মুক্তির স্বপ্নের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। তারা গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চল থেকেই এসেছিল। তারা সবসময় সমাজের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে থাকতো। সুতরাং, চলমান রাজনীতি সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। চাষি এবং শ্রমিক উভয়ের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এই ধারণা তাদের সাহায্য করেছিল। একইভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরও তারাই আরও সচেতন করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। কার্যত তারাই আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল। বঙ্গবন্ধুও এসেছিলেন সেই আলোকিত

মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এবং তিনি ছিলেন এ নেতৃত্বের একেবারে অগ্রভাগে। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানসহ এক ঝাঁক মধ্যবিত্ত সহ-নেতৃত্ব তাঁকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে গেছে। পাশাপাশি ছিল মণি সিংহ, মুজফ্ফর আহমদ, মাওলানা ভাসানীসহ বিপুল সংখ্যক বাম রাজনীতিক। তারাও মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির, তবে তারা কাজ করতেন কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য।

পাট উৎপাদন পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সারা বিশ্বের কাঁচা পাটের ৯২ শতাংশ পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্ব বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে কলকাতায় পাটকলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশও ঘটতে থাকে। এ পাট উৎপাদন ও পাটের ব্যবসার সাথে জড়িত ফড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগীর বেশিরভাগই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। পাটের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে এরাও পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে তারা কলকাতার পৌর-অভিজনদের দলে ভিড়তে থাকে। এরাই এক সময় কলকাতাভিত্তিক ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসকরা এর জবাবে 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি'তে শাসন করতে থাকে। এ কারণেই ১৯০৫ সালে বাংলার বিভক্তি ঘটে। নতুন প্রদেশের মূল রাজধানী হয় ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় এখানে অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। প্রাদেশিক আদালতকে ঘিরে একদল আইনজীবীর উদ্ভব হয়। এভাবেই তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পেতে শুরু করে। কিন্তু ঐ সময় কলকাতাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাপে ব্রিটিশ প্রশাসন পুনরায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। তবে এই অল্প সময়ের জন্য পাওয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব বাংলায় যে অভিজন সম্প্রদায়ের কাছে আশীর্বাদ বলে বিবেচিত হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। এজন্য বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখানোর সুযোগ তারা পেয়ে যায়। পূর্ব বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিকাংশ মুসলমান অভিজন বুঝতে পারলো কলকাতার হিন্দু প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশবিশেষ তাদের প্রতি আন্তরিক নন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে যেখানে কলকাতার শিক্ষিত জনসংখ্যার পরিমাণ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল

সেখানে সারা বাংলায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৭ শতাংশ। ১৯০৫ সালের পরে কর্মসংস্থান ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সারা পূর্ব বাংলায় যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে ভাটার টান লাগে। সাধারণ চাকরি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ ব্যবসা করার জন্যে যে পুঁজির প্রয়োজন তা জোগান দেওয়ার মতো অতিরিক্ত অর্থ এ অঞ্চলে মধ্যবিত্তের হাতে ছিল না। সরকারি চাকরির জন্য প্রয়োজনবোধে শর্ত শিথিল করে মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবকদের চাকরি দিতে মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তৎপরতা চালান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই দাবির পক্ষে বিখ্যাত বাংলা চুক্তির মাধ্যমে তাঁর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১৯২৩ সালে নির্বাচনে মুসলমানদের অভূতপূর্ব সমর্থন নিয়ে তাঁর স্বরাজ পার্টি জয়যুক্ত হয়। তিনি বাংলা চুক্তিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেন এবং মুসলমানরা তাঁকে সেজন্যই বিশ্বাস করতো। সুতরাং তাঁরা তাঁকে নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে তিনি মারা গেলেন এবং স্বরাজ পার্টির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দ্রুতই হারিয়ে গেল। আর এভাবেই মধ্যবিত্ত মুসলমানরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বহিরাগত দল ছিল। অবাঙালি জমিদারদের প্রভাবে এটি চলতো। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে রাজি হওয়ার সাথে সাথেই মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার বিপুল সমর্থন পেল। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর লাহোর প্রস্তাব এক নতুন মাত্রা যোগ করলো। পূর্ব বাংলার কৃষকরা জমিদারদের (বেশিরভাগ হিন্দু) শোষণে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত মুসলমানরা সর্বান্তকরণে চেয়েছিল যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা স্বপ্ন দেখেছিল এমন একটি সৎ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের যাতে তারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আগের চেয়ে ভালো থাকতে পারবে।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। জমিদারি প্রথা সত্যিকার অর্থে তখনও লোপ পায়নি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রশাসন ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে কম নির্মম কিছু ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যরা তাদের উন্নয়নের ধারা নিয়ে দারুণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল। খাজা

নাজিমউদ্দীন বরাবরই জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। আর তিনি হলেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি কখনোই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইচ্ছের মর্যাদা দেননি। বরং অবাঙালি আমলা, প্রকৌশলী ও শিল্পপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে রইলেন। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধনী হিন্দুরা দলে দলে ভারত চলে গেল। ফলে ব্যবসায় ও প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিল (করিম, ১৯৮৪, পৃ: ২৪১)। যেসব মুসলমানের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি ছিল তারা দেশান্তরী হিন্দুদের সম্পত্তি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা ব্যবসায় ও শিল্পেও তাদের পুঁজি খাটালো না।

শিগগিরই এই শূন্যস্থান অবাঙালিদের দ্বারা পূরণ হতে লাগলো। তারা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০, প্রাগুক্ত)। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যরা শিগগিরই বুঝতে পারলো যে, তারা অবাঙালি আমলা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তাদের আশা পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমর্থন সম্পর্কে তারা বিশ্বাস হারালো। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতাশার কারণ না খুঁজে শাসক সম্প্রদায় বরং বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলো। ফলে বাঙালি অভিজনদের হতাশা আরও তীব্র হতে লাগলো।

সাথে সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাদের ইচ্ছেমতো সংকীর্ণ মৌলবাদী সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলো। সুতরাং, তারা শুরুতেই বাংলা ভাষার মর্যাদার উপর আঘাত আনল। তৎকালীন পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার জায়গায় জোর করে তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই অসৎ উদ্দেশ্য দ্রুতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ভাষা আন্দোলন সেই অর্থে বাঙালি মধ্যবিত্তের ঐ চ্যালেঞ্জেরই ফসল।

যে অঞ্চল নিয়ে আজকের বাংলাদেশ সেখানে ভাষা-বিতর্কের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাসত্ত্বেও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে আছে বেশিরভাগ বাঙালির কাছে। তবে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সময়টিকেই ঘিরে বলে বেশিরভাগ গবেষকের লেখায় উঠে এসেছে। এই আন্দোলনকে নিছক বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াই মনে করলে সবটা বলা হবে না। ১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন

ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দিলেও তাঁর সাথে গভীর সংযোগ ছিল এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তসহ সাধারণ মানুষের। তাইতো একুশে ফেব্রুয়ারির গণবিস্ফোরণের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার দাবিতে ছিলনা, সেটা ছিল আমাদের জীবন-মরণের লড়াই। আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমরা খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, আশ্রয় চাই, নাগরিক অধিকার চাই। আমরা কথা বলার অধিকার চাই, শোষণমুক্ত সমাজ চাই।" ('সিক্রেট ডকুমেন্টস', প্রতিবেদন নং ৪৭, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)।

পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পায়নের 'বন্দী বাজারে'ই পরিণত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম লীগের সমর্থক প্রগতিশীল তরুণ কর্মীরা। তারা দারুণ হতাশ তখন। তাই পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের বিরোধিতা শুরু করে এই তরুণ কর্মীরা। এদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক সন্তান। কেউ কেউ আবার এক-প্রজন্মের শহরবাসী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ। অনেকেই অস্পষ্টভাবে হলেও বামঘেঁষা। এরাই আওয়ামী মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মীদল হিসেবে বেড়ে ওঠে। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। কমিউনিস্ট পার্টির অনেকেই, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীরা এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের কৃষকদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী এক সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বাংলা ভাষার ওপর আঘাত এলে এরাই তীব্রভাবে প্রত্যাঘাত হানে। তাদের সঙ্গে শুরুতে না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে যুক্ত হয় ব্যাপক সংখ্যক কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার ওপর যে আঞ্চলিক নিপীড়ন চাপিয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটে কখনও সংবিধান, কখনও অর্থনীতি, কখনও ভাষা সংক্রান্ত নীতির মধ্য দিয়ে। ভাষা-প্রশ্নটি ছিল সামনের প্রসঙ্গ। পেছনে ছিল আঞ্চলিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই এ বিদ্রোহ ছিল অনিবার্য। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির ভাঁওতাবাজির প্রধান শিকার কৃষক-শ্রমিকরাই তৈরি করেছিল ভাষা আন্দোলনের নির্মাণ-রসদ।

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবাই এসেছিল বঙ্গবন্ধুর মতো শ্রেণি অবস্থান থেকে। তাদের চাওয়া-পাওয়াও ছিল প্রায় একই রকম। তাদের তিন-চতুর্থাংশই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিল। ভাবাবেগে ৬৭ শতাংশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ২৫ শতাংশ উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ৭৩ শতাংশ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল। ৪ শতাংশ মুসলিম লীগ সম্বন্ধে ইতিবাচক– যদিও সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত ছিল। উর্দু রাষ্ট্র ভাষা ব্যক্তিগত ক্ষতির চেয়ে জাতীয় বিকাশ ব্যাহত হবে বলে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করতো। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা তখন নানা সংকটে। তাই ভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি থেকেই বের হয়ে এসেছিল উনসত্তর এবং একাত্তরের জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব। ১৯৪৮-৫২ পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে শুভ সূচনা হয় তারই সফল উত্তরণ ঘটে একাত্তরে। ঔপনিবেশিক ও তার সহযোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে অধঃস্তন শ্রেণি সমূহের (তথা পেটিবুর্জোয়া, ধনী ও মাঝারি ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক) এক অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল বলেই এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল (রহমান, ১৯৯০, পৃ: ১৬-২১; ২০০০)। তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ভাষা আন্দোলন অধঃস্তন শ্রেণিসমূহের এক মিলিত চৈতন্যের ফসল।

আগেই বলেছি, পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ কৃষক সম্প্রদায় থেকে এসেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে তারা সক্রিয় ভূমিকাও রেখেছিল। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই তারা মনে করেছিল, রাষ্ট্র তাদের আবেগ অনুভূতির মূল্য দিয়ে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দেবে। কিন্তু বাস্তবে তারা বরং উর্দুকে সেই মর্যাদা দিলো। বাংলাকে করলো অপমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ- ছাত্ররা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করলো। এমন কি বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে তাদের রক্ত ঝরলো। তারা সরাসরি সরকারের রাষ্ট্রভাষা নীতির বিপক্ষে চলে গেল। তাদের এই আন্দোলনে অংশ নেয়ার পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান দুটো কারণ হলো-

এক. বাংলা অপমানিত হওয়ার কারণে তারা মনে করলো, পাকিস্তান বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং গর্বের বিরুদ্ধে। যারা মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, তাদের

ভাষার প্রতি এই অবিচার বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়া এক সময়ে সাধারণ মানুষের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

দুই. তারা এটা উপলব্ধি করতে পারলো যে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তাদের সরকারি ও আধাসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হবে। তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো হারিয়ে যাবে। তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাবে। তাদের সংস্কৃতি বিকশিত হবে না।

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথাও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন। এ সময়টায় তাঁর নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে সারা পূর্ব বাংলা সফর করেন এবং জনসভা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় গরিব চাষিদের ভাগ্যোন্নয়ন ছাড়াও পাট ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষানীতির ব্যাপক সমালোচনা করেন (রহমান, ২০২১)। জনগণের দুঃখ বঞ্চনার দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে বলে তিনি বারে বারে দাবি করেন। তিনি তাঁর ভাষণে প্রশাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার কথা বলেন। কর কাঠামোতে গরিবের স্বার্থ যে বিঘ্নিত হচ্ছিল সে কথাও তুলে ধরেন। খাদ্য সংকটে সরকারের উদাসীনতারও তীব্র সমালোচনা করেন। আর বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা তো সর্বক্ষণই বলতেন। আর এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে গণমানুষের পছন্দের নেতায় পরিণত হন।

ভাষা আন্দোলনে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণ ঐ শ্রেণির শিক্ষিত অংশের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে। মাতৃভাষায় পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্বসাধারণের দাবির মাধ্যমে বাঙালি জাতির পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজটি দক্ষতার সাথেই করতে পেরেছিল নেতৃত্বে থাকা অপেক্ষাকৃত বেশি আলোকিত অংশটি। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সংখ্যাগুরু বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে মোটেই আন্তরিক ছিল না ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটে পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে। ঐ নির্বাচনে বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত ২১-দফা আসলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিচ্ছবি।

এই ছবিটি আরও পরিষ্কার হয় যখন এই দাবিটি শ্রমশক্তির বিভিন্ন উপদলে বণ্টন করে দেখা হয়। ১৯৬১ সালে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৬ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। কিন্তু ২১-দফায় প্রায় ৬৮ শতাংশ আর্থ-সামাজিক দাবি-দাওয়াই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘিরে। এটা অভাবিত নয়। কার্যত যুক্তফ্রন্ট ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক জোট। সুতরাং নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সত্যিকার অর্থে, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে শহুরে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সংযোগ ছিল খুবই গভীর। রাজনৈতিক নেতারা ছিল মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণির প্রথমদিককার প্রজন্ম। সুতরাং কৃষকদের আর্থ-সামাজিক দাবি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রাণের দাবি ছিল।

তখন দেশে প্রায় ২৭,৬০,০০০ কৃষি শ্রমিক ছিল। তাদের একটি মাত্র দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা সংখ্যায় কৃষি শ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম, তাদের জন্য প্রায় ১৮টি দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরুনই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৯১টি আসন দখল করে এবং শাসকদল মুসলিম লীগকে ১০টি আসন নিয়েই খুশি থাকতে হয় (সেন, ১৯৮৬, পৃ: ১২৪)। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চক্রান্ত এবং পূর্ব বাংলার অভিজন নেতাদের একতার অভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত কেন্দ্রীয় আমলারা পূর্ব বাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রকে দুরূহ করে তোলে এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। প্রথমদিকে তারা পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করলেও ১৯৫৮ সালের পর তারা আনুষ্ঠানিকভাবেই তা করতে শুরু করে।

সামরিক শাসনের প্রথম পাঁচ বছর সামরিক শাসক আইয়ুব খান প্রচণ্ড রূঢ় ছিলেন এবং কোনো সংগঠনের প্রতিবাদকে মাথাচাড়া দিতে দেননি। কিন্তু ১৯৬২ সালে ছাত্ররা খুবই সবল একটি শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করলো এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যান্য অংশও আন্দোলনের উদ্যোগকে সমর্থন দিতে শুরু করলো। পাকিস্তান রাষ্ট্রও প্রচণ্ডভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্র নিজেই উদ্যোগী হয়ে সাধারণ দাঙ্গা লাগিয়ে দিল, যা প্রকারান্তরে বাঙালির জন্যে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। এই ঘটনা তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। এই

দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু। সেদিন তিনি পূর্ব বাংলাকে এই হীন প্রচেষ্টাকে রুখে দেবার ডাক দিয়েছিলেন। এরপর জনসাধারণ গণতান্ত্রিক এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাদের দুরবস্থা ও বিপদ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর একটু আগেই যেমনটি বলেছি, এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ উন্মেষে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি কতটা জনবান্ধব ছিল।

ষাটের দশকের শুরুর দিককার আন্দোলনের প্রধান সারিতে ছিল শ্রমিক, ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ১৯৬৯-এ আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে আইয়ুব খানকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হলো। ঐ গণঅভ্যুত্থানের মুখ্য দাবিই ছিল শেখ মুজিবের মুক্তি। সেই মুক্তির পরপরই তিনি গণ-উপাধি 'বঙ্গবন্ধু'তে ভূষিত হন। কিন্তু সামরিক শাসন তখনও বহাল ছিল। তারপর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করলেন। আজাদ (১৯৯৩)-এর গবেষণা মতে, ১৯৬৪ থেকে '৬৯-এর মধ্যে প্রায় ৪২৬টি ধর্মঘট হয়েছিল। যার ২৫ শতাংশ ধর্মঘটই ছিল ছাত্রদের নেতৃত্বে। তার মানে আন্দোলনকারীদের মধ্যে তারাই ছিল প্রভাবশালী।

অফিস এবং অন্য কর্মজীবীরা ডেকেছিল ২৭ শতাংশ এবং সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ডেকেছিল মাত্র ১৪ শতাংশ ধর্মঘট। অন্যভাবে বললে, সনাতন এবং নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি সেই সময় একত্রে প্রায় ৬৬ শতাংশ ধর্মঘট ডেকেছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিরুদ্ধে আহুত ধর্মঘট বাস্তবায়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ধর্মঘট ছাড়াও প্রতিরোধের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রতিরোধে যোগ দেয়। এ সময় সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে ৩৭ শতাংশ বিক্ষোভ ছাত্ররা সংগঠিত করেছিল। সাংবাদিক ও শিক্ষকদের প্রতিরোধের হার ছিল ১৫ শতাংশ। কৃষকরাও নিশ্চুপ ছিল না (১৪ শতাংশ)। চাকরিজীবীরাও (৫.৫ শতাংশ) তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিল। বাঙালি শিল্পপতিরাও সরব হয়ে ওঠে (৪ শতাংশ)। মজার ব্যাপার হলো, দৈনিকে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ৫৭ শতাংশ সংবাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই সংযোগ ছিলো।

এক সমীক্ষায় (১৬২ জন উত্তরদাতা) দেখা গেছে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশ ছিল শহুরে এবং বাকি ৬০ শতাংশ ছিল গ্রামের

অধিবাসী (আজাদ, ১৯৯৩)। এ ৪০ শতাংশ ছিল উদ্বৃত্ত কৃষক। পেশাগত দিক থেকে তারা ছিল ছাত্র, অফিস কর্মজীবী, দোকান মালিক ইত্যাদি। বাকি ৪৩ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের। ৮৩ শতাংশের পারিবারিক আয়ের উৎস ছিল আংশিক অথবা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। তাদের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১৬ হাজার ৩১৬ টাকা।

আয়ের এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত ছিল। কেননা, ঊনসত্তরের বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ছাত্ররাই যে সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারকারী অংশ ছিল সে ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী, দোকানদার এবং বস্তিবাসীদেরও আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

এ কথা ঠিক, ১৯৬০-এ আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশাল অবদান ছিল এবং তাদের এই অংশগ্রহণ বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী ভাবনা স্পষ্টভাবে জাগিয়ে তোলে। উল্লিখিত জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেন, তারা আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস ও অবদমন করছিল এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও বিপন্ন হচ্ছিল বলেই তারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল (৬৪ শতাংশ)।

উত্তরদাতাদের অনেকেই (৬০ শতাংশ) বলতে চেয়েছে যে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল মুক্তিযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। কার্যত ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতাই বলেছে, তারা ১৯৬৯-এর আন্দোলনের সময় স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিল। যারা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাই আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না, যদিও তাদের অনেকেই রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব না করলেও তাদের এই মতামত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কেননা তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল গভীর। তাদের অনেকেরই পিতামাতাও ছিলেন গ্রামে।

এটা নিশ্চয় করে বলা যায়, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান যে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল সে কথাটি অনুমান করা যায়। ইতিহাসের ধারাও ঠিক সেই পথেই ধাবিত হয়। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে

শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীকালে ছাত্রদের নেতৃত্বে উত্থাপিত ১১-দফায় পরিষ্কারভাবেই জাতীয় দাবির পাশাপাশি গণমানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাম রাজনীতিকরা গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল দল আওয়ামী লীগ সঠিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। দলের নেতারা সফলভাবেই নির্বাচনের প্রাক্কালে দেয়া বক্তৃতা-বিবৃতিতে গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেন। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক শ্রেণি, প্রান্তিক চাষি, ছাত্র তথা পুরো বাঙালি জাতিই তাই ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। কিন্তু নির্বাচনে জিতেও তারা তাদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় (রহমান, ১৯৯৮)। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। খুবই দক্ষতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সকল জনগণের সমন্বিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধকালে বিভিন্ন পেশার মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সে কথাই প্রমাণ করে। আর সে কারণেই তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে খেটে-খাওয়া মানুষের অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন:

"যাঁরা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, সেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা" (রহমান, ১৯৮২, পৃ. ১৫)।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের সেই প্রত্যয়ই ছিল একাত্তরে সকল বাঙালির এক হওয়ার মূল অনুপ্রেরণা। আর সেই ঐক্যের বলেই অল্প সময়ের মুক্তিযুদ্ধেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিক সেই বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব এখনও সামনের কাতারে। সমকালীন বাস্তবতায় সামাজিক সুস্থিতি ও উন্নয়নের স্বার্থেই মুক্তিযুদ্ধের মতোই জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। তবে মধ্যবিত্তের একাংশের সুবিধাবাদিতা, দুর্নীতি প্রবণতা এবং স্বেচ্ছাচারিতাকেও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল অংশ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সাহসী ভূমিকা অপরিহার্য। আশার কথা, মধ্যবিত্তের তরুণ সন্তানেরা ফের মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে বুকে ধারণ করে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের উপযুক্ত শাস্তির পক্ষে বিশাল জনমত গঠন করতে

সক্ষম হয়েছিল। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারও সম্পন্ন হয়েছে। এই চেতনাকে আরও শানিত করা গেলে মুক্তিযুদ্ধের মৌল আকাঙ্ক্ষা সঠিক মুক্তি অর্জন করা নিশ্চিত সম্ভব হবে। এই মৌল চেতনার পক্ষে লড়াই নিঃশেষ হবার নয়। আশা করছি, এই পর্যায়ের সংগ্রামেও মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার যোগ্য ভূমিকা পালনে পিছপা হবে না। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ সেই পথে অনেকটাই এগিয়েছে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই বাংলাদেশ এগিয়ে চলুক সেই প্রত্যাশাই করছি।

তথ্যসূত্র

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭): *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

করিম, এ কে নাজমুল (১৯৮৪): *মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত*, এ কে নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষ, বিনয় (১৯৯৩): *বাংলার নবজাগৃতি*, পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, কোলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড।

রহমান, আতিউর (সম্পাদিত) (১৯৯০)। *ভাষা আন্দোলনের আর্থসামাজিক পটভূমি*, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬-২১, দ্বিতীয় সংস্করণ (এক খণ্ডে), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০।

রহমান, আতিউর (১৯৯৮): অসহযোগের দিনগুলি: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব (২য় খণ্ড ২০০৪), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রহমান, আতিউর (২০২১): *সিক্রেট ডক্যুমেন্টস সংক্ষিপ্ত ও সরল পাঠ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) (১৯৮২): *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রহমান, আতিউর ও আজাদ, লেনিন (১৯৯০): *ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি*, দ্বিতীয় খণ্ড, ইউনির্ভাসিটি প্রেসদ লিমিটেড, ঢাকা।

সেন, রঙ্গলাল (১৯৮৬): *পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা।

ড. আতিউর রহমান জন্ম ০৩ আগস্ট ১৯৫১ (সনদপত্র অনুসারে), জামালপুরে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ অন আর্টস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারপারসন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিআইডিএসের একজন সিনিয়র ফেলো। দীর্ঘকাল বিআইডিএসে যুক্ত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ২০০৬ সালে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ২০০৯ থেকে প্রায় সাত বছর আর্থিক সেবা খাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে প্রযুক্তিনির্ভর সেবাসহ অন্যান্য উদ্ভাবনী কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নীরব বিপ্লব'-এ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। জনবান্ধব গবেষণার জন্য 'গরিবের অর্থনীতিবিদ' এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নে নেতৃত্বের কারণে 'সবুজ গভর্নর' হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ভাবনাও তাঁর গবেষণায় সবসময় গুরুত্বের জায়গায় রয়েছে।

মোট ৯৬টি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অসংখ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা/সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *পিজ্যান্টস এন্ড ক্লাসেস*, *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, *বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ*, *বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি*, *শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম*, *তব ভুবনে তব ভবনে*, *রবীন্দ্র ভাবনায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি*, *রবীন্দ্র চিন্তায় দারিদ্র্য ও প্রগতি*।

বেস্ট সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক ২০১৫ (ফাইনান্সিয়াল টাইমস), গুসি শান্তি পুরস্কার, ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ স্মারক, শেলটেক পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫, বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২১, রবীন্দ্র একাডেমি সম্মাননা ২০২২ সহ অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেয়েছেন। তাছাড়া বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলো ড. আতিউর রহমানকে চ্যানেল আই আজীবন সম্মাননা প্রদান করেছে ২০১৮ সালে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)
ই-১৭, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, জি.পি.ও বক্স নং ৩৮৫৪, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪৩০-৩৭, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪১০, ওয়েবসাইট: www.bids.org.bd